‘মানুষকে উপেক্ষা করে শিল্পচর্চা বড় হয়ে উঠতে পারে না’

কথাশিল্পী রিজিয়া রহমান

wiwRqv ingvb evsjv‡`‡ki c_g mwii Jcb¨vwmK‡`i g‡a¨ GKRb| gvÎ bÛeQi eq‡m †jLvi Kjg a‡ib|¯‹‡j wbP Kv‡mi QvÎx _vKvKv‡jB †KvjKvZvi ÛmZ¨hMÛ I XvKvi Ûmsev`Û cwÎKvq Zvi Mí I KweZv cKwkZ nq| Iv‡Ui `k‡KB wZwb evsjv‡`‡ki mwnZ¨ RM‡Z cvVK‡`i Kv‡Q cwiwPZ n‡q I‡Vb| wiwRqv ingv‡bi iwPZ M‡ši msL¨v wZwi‡ki AwaK| †jLv‡jwLi A½‡bi cvq me¸‡jv kvLv‡ZB Zvi Kj‡gi ¯”Q›`¨ wePiY| mwn‡Z¨ Ae`v‡bi Rb¨ wZwb †`‡k Ges we‡`‡k cksmZ n‡q‡Qb, †c‡q‡Qb GKwaK ci¯‹vi| GB e‡iY¨ K_vkíxi mv¶vZKvi MnY K‡i‡Qb **মারুফ রায়হান**

প্রশ্ন : আপনার লেখালেখির সূচনাপর্ব এবং ক্রমশ লেখক হয়ে ওঠা সম্পর্কে জানতে চাই?

রিজিয়া রহমান : আমার লেখক হয়ে ওঠাটা কিন্তু কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। জীবনের প্রথম পড়া ‘অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে, আ-তে আমটি আমি খাবো পেড়ে।’ শব্দ ও ছন্দের মাধ্যমে বর্ণ পরিচয় পর্বের এই শুরু থেকে যেমন ক্রমে একটার পর একটা শিক্ষাস্তরের ধাপ পেরিয়ে গেছি, হাতে এসেছে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটি, তেমনি লেখক হওয়ার সূচনাপর্বটি অতিক্রম করে নিরন্তর কলম ধরে থাকাই সম্ভবত আমাকে লেখক করে তুলেছে।

আর একটু খুলে বলি, আট-সাড়ে আট বছর বয়সেই হঠাৎ একদিন একটি ছন্দের কবিতা লিখে লেখার অঙ্গনে প্রথম প্রবেশ আমার। তারপর থেকে লেখার কলমটি আর হাত ছাড়া হয়নি। কলকাতার ‘সত্যযুগ’ ঢাকার ‘সংবাদ’ পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে কবিতা ও গল্প প্রকাশের মাধ্যমে আমার লেখক হওয়ার শিক্ষানবিশীর শুরু। তারপর যথারীতি পত্রিকায় বড়দের পাতায় প্রবেশ, প্রথমে গল্প, পরে উপন্যাস নিয়ে। এমন ভাবেই এক সময় হয়ে গেলাম বাংলা সাহিত্যের এক আলোচিত কথাশিল্পী।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি, প্রকাশনার খুঁটিনাটি, প্রকাশকালীন অনুভূতি এবং প্রকাশ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া/ আলোচনা/ সমালোচনা সম্পর্কে বলুন।

রিজিয়া রহমান : সাহিত্য জগতে লেখক হিসেবে প্রথম অধিষ্ঠান, আমার একটি গল্প সংকলন নিয়ে, নাম ‘অগ্নি স্বাক্ষরা’। এর গল্পগুলো সবই আমার ছাত্র জীবনের রচনা এবং ঢাকার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। তবে এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য দুটি গল্প ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’ ও ‘লালটিলার আকাশ’ যথাক্রমে ইডেন ডিগ্রি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকায় বেরোয়। গল্প লিখে প্রচুর খ্যাতি পাওয়া তখন থেকেই শুরু হয়। জীবনে প্রথম লেখা উপন্যাসটি আমাকে হতবাক করে অভাবিত খ্যাতি বয়ে এনেছিল আমার জন্য। এই সময়ে আমার এক মামা আবদুর রহমান ভুইয়া চট্টগ্রাম ক্যাডেট কলেজে অধ্যাপনা করতেন, ঢাকার চারুকলা শিক্ষায়তন থেকে পাস করেছেন। বললেন একদিন- তোর গল্পগুলো তো খুব চমৎকার। এগুলো নিয়ে একটা গল্প সংকলন তো বের করা যায়। বই প্রকাশের কথা এর আগে কখনো মাথায় আসেনি, সেই প্রথম এলো। উৎসাহ জোগালেন মামা। প্রকাশনা নিজেদেরই। বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকলেন আমার চারুকলাবিদ মামাই। শুরু হলো ছাপার কাজ। এমএ ফাইনাল পরীক্ষা সামনেই। সারা দিন লেখাপড়ায় ডুবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয়। এর মধ্যেই দেখি বইয়ের প্রুফ। পরীক্ষার ঠিক সপ্তাহ দেড়েক আগেই হাতে এসে গেল ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’র প্রথম কপিটি।

নিজেকে আমি ভাগ্যবতীই বলবো, কারণ আমার প্রথম বই ‘অগ্নিস্বাক্ষরা’র আলোচক-সমালোচকেরা অনেকেই ছিলেন স্বনামখ্যাত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। টেলিভিশনে সমালোচনা করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন। ‘পাকিস্তান অবজারভার’ পত্রিকায় আলোচনা লিখেছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জুলফিকর হায়দার সাহেব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের তৎকালীন প্রধান ড. মুহম্মদ আবদুল হাই আলোচনা করেছিলেন রেডিওতে-সাহিত্য অনুষ্ঠানে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তিনি। তাঁর আলোচনার একটি অংশে তিনি বলেছিলেন- ‘এতোখানি শিক্ষা ও মার্জিত রুচির অধিকারিণী হয়ে খুব কম বাঙালি মহিলাই আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করেছে।’ এসব আলোচনা তৈরি হতে থাকা একজন কথাশিল্পীকে নিঃসন্দেহে আত্মপ্রত্যয়ী করেছিল। তাদের অভিনন্দন ও গঠনমূলক সমালোচনার জন্য অবশ্যই আমি ঋণী।

প্রশ্ন : লেখালিখির শুরুর দিকে কথাসাহিত্যে আপনার আদর্শ কে ছিলেন? কার কার রচনা আপনাকে অনুপ্রাণিত করতো? পরবর্তীকালে আপনার সেই সাহিত্য বিবেচনায় কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে?

রিজিয়া রহমান : ছেলেবেলা থেকেই তো সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। হয়ে উঠেছিলাম বইয়ের জগতের মানুষ যাকে বলা যায় গ্রন্থকীট। বাড়িতে ছিল প্রচুর বই। সুতরাং ‘মুন্নির ম্যাজিক পেয়ালা’, ‘ঠাকুরমায়ের ঝুলি’ ছাড়িয়ে আমার মায়ের বইয়ের আলমারিতে হাত বাড়াতে দেরি হয়নি। কিশোর সিরিজের

গল্প-উপন্যাস শেষ না হতেই পড়ার জগৎ বিস্তৃত হয়ে গেল। কৈশোর না পেরুতেই বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হলো ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেশী-বিদেশী যত বিখ্যাত সাহিত্যের ভুবনে প্রবেশ আমার। বয়ঃসন্ধিতেই পড়েছি রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, শেষের কবিতা।

শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটকগুলো ভীষণ ভালো লেগেছিল। 'মার্চেন্ট অব ভেনিসের' পোর্সিয়ার চরিত্র, এ সময়ে পড়া যে সব বই আমাকে ভালো লাগায় আচ্ছন্ন করতো সে সব বইয়ের কয়েকটির কথা আমার আজো মনো পড়ে, যেমন রঁমা রলার 'জা ক্রিস্তফ' ভিকতর হিউগোর 'লা মিজারেবল' ও 'হান্চ ব্যাক অব নতারদাম', চার্লস ডিকেন্সের 'অলিভার টুইস্ট', এমিলি ব্রন্টির 'উইদারিং হাইটস্'। আর জেন অস্টিনের 'প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস'। বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস সে সময়ে আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। কলেজে পা রেখেই পরিচয় রুশ আর ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে। এ সময়ে আমার প্রিয় লেখক হয়ে উঠলেন দস্তয়ভস্কি, আলেকজান্ডার পুশ্‌কিন, আন্তন শেখভ, তুর্গেনিভ ও তলস্তয়। তবে সবচেয়ে আলোড়িত করেছিল নিকোলাই গোগোলের 'ওভার কোট' গল্পটি। সেটি আজো রয়েছে আমার প্রিয় গল্পের শীর্ষে। যেমন প্রিয় উপন্যাস হিসেবে রয়েছে তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস।' ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে মোপাসাঁর লেখা 'নেকলেস' গল্পটি এবং এমিল জোলার 'জারমিলান' উপন্যাস আমাকে বিশেষভাবে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের সমারসেট মমের 'অব হিউম্যান বন্ডেজ' এবং ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের লেখা ছোটগল্পগুলো ভীষণ ভালো লাগতো। ক্যাথরিনের গল্পের আঙ্গিকের অভিনবত্ব এখনো আমার প্রিয়। আর বিশেষ প্রিয় আমেরিকান লেখক স্টেইনবেকের 'রেডপনি' এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য সান অলসো রাইজেস'। এদিকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকোত্তর বা 'পোস্ট মডার্নিজমের' অনুসারী লেখকরাও ছিলেন আমার কাছে আকর্ষণীয়। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশের কবিতা এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলো ছিল এবং নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুসারী লেখক বিমল করের লেখাও ছিল আমার ভীষণ পছন্দের। এসব ভালো লাগা লেখকের কালজয়ী লেখাই আমাকে লেখার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে আদর্শ হিসেবে নির্দিষ্ট কাউকে সম্ভবত আমি নির্বাচন করিনি। বরং বলতে পারি আমার পড়া বাংলা সাহিত্যের এবং বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোই ছিল হয়তো আমার আদর্শ।

প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধকালে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার অনুভূতি কি রকম ছিল? তাৎক্ষণিকভাবে গণহত্যার কোনো সাহিত্যিক প্রতিবাদের উদ্যোগ নেয়া কি সম্ভব হয়েছিল?

রিজিয়া রহমান : মুক্তিযুদ্ধের ন'টি মাস দখলদার শত্রুবাহিনীর অস্ত্রের মুখে বন্দি এই ঢাকা শহরেই। অনুভূতি? আতঙ্ক, আশঙ্কা, উদ্ভ্রান্তি এসব শব্দগুলো দিয়ে কি সে অনুভূতির বিবরণ দেয়া যায়? আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস, হালাকু খান কিংবা তৈমুর লঙ অথবা হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন নিরস্ত্র মানুষের জনপদ অবরোধ করে রেখেছিল, গণহত্যার রক্তস্রোতের ওপর আয়েশের গালিচা বিছিয়েছিল, নারীর সম্ভ্রম আর শিশুর আর্তনাদকে রক্তাক্ত সুরায় ঢেলে উল্লাসের উপভোগে মত্ত হয়েছিল, তখন সেই সব নগর নগরীর বন্দি মানুষের যে অনুভূতি হয়েছিল আমারও তাই ছিল। জানতাম আজরাইল ঘাতক জল্লাদকে নিয়ে যখন তখনই এসে দরোজায় পদাঘাত করবে। হারাতে হবে সম্ভ্রম, প্রাণ। সে অনুভূতি এক ভয়ঙ্কর সময়ের অনুভূতি। আশ্চর্য এই দুঃসহ দুঃসময়ের উপায়হীনতার মাঝেই মনের মাঝে বিস্ফোরিত হয়েছিল অমানুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণার আক্রোশ। জন্ম নিয়েছিল প্রতিশোধের স্পৃহা, সমুচিত প্রত্যুত্তর দেয়ার দুর্দান্ত সাহসী আকাঙ্ক্ষা।

না, পথে-ঘাটে মিছিল করে বা লিখে কোন সাহিত্যক প্রতিবাদ জানাবার উপায় আমাদের ছিল না। আমরা তখন ছিলাম বিচ্ছিন্ন গৃহবন্দি, নিরুপায় মানুষ মৃত্যু যাদের দিনরাত্রি হুমকি দিতে থাকে। তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, প্রতিটি বাঙালি মনেই তখন জ্বলছিল যুদ্ধের ঘোষণা। শত্রুকে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতির ক্ষেত্র মনের ভেতরে তৈরি হচ্ছিল প্রতিনিয়ত প্রতিটি বাঙালির। তারপরই জ্বলে উঠেছিল আশার আলো- প্রত্যাঘাতের সাহস নিয়ে শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। এরপর জড়িত ছিলাম মুক্তিবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধের সহায়তাদানে। সে এক আশ্চর্য উদ্দীপনাময় সময়। সময়টা যেন ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। মাতৃভূমির জন্য, স্বাধীনতার জন্য এতোখানি সাহসী এতোখানি উদ্দীপ্ত আর কখনোই হইনি। সে অনুভূতি দীর্ঘ বিবরণ দাবি করে নিঃসন্দেহে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন যে সার্থক কথাশিল্প সৃষ্টির জন্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন?

রিজিয়া রহমান : অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তবে, সর্বক্ষেত্রে নয়। কখনো কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াই কোনো উপন্যাস বা গল্প হয়ে উঠতে পারে সার্থক কথাশিল্প। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ বা সংগৃহীত অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান অথবা গবেষণাময় দৃষ্টিভঙ্গি সার্থকতা এনে দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, একটি সার্থক মহৎ শিল্পকর্ম শুধু লব্ধ অভিজ্ঞতার ওপরেই নির্ভরশীল নয়, শিল্পীর কল্পনাশক্তির তীক্ষ্ণতা, প্রখর বাস্তবতা জ্ঞান, কল্পনা ও বাস্তবতাকে একীভূত করার পারদর্শিতা। সর্বোপরি কলমের প্রকাশ-দক্ষতা না থাকলে, যত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন, তার সৃষ্টি ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হতে পারে। অপরদিকে অনেক পরোক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাও শিল্পীর দক্ষতার গুণে হয়ে উঠতে পারে বাস্তবস্পর্শী সার্থক সৃষ্টি।

Qwe‡Z wiwRqv ing‡bi m‡½ Av‡Qb Aveyj Kv‡kg dRjyj nK, Avey Lv‡qi gm‡jnDwÏb, iv‡eqv LvZb, RevB`yi ¸jkvb Aviv Ges †gvnv¤§` gwbi“¾vgvb

প্রশ্ন : কোনো বিশেষ জনপদ লেখায় তুলে আনবার জন্য সরাসরি সেই এলাকায় কি ভ্রমণ করেন? মানুষের ইন্টারভিউ নেন? একটি উপন্যাস লেখার জন্য আপনার প্রতিক্রিয়া কি?

রিজিয়া রহমান : ভ্রমণ তো করিই। তবে এই ভ্রমণের আগেও একটি ভূমিকাময় ভ্রমণ থাকে। কথাটা স্বচ্ছ হলো না, খুলে বলি। আমার লেখার যারা পাঠক, তারা জানেন যে, আমার বহুল আলোচিত উপন্যাসগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আঞ্চলিক জীবনালেখ্য। আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আমার ভ্রমণ থেকেই পাওয়া। কিন্তু কোনো থিসিস লেখার উপাত্ত সংগ্রহের বা সাংবাদিকের প্রতিবেদন রচনার তথ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ প্রক্রিয়ায় আমি আমার উপন্যাস রচনার পটভূমি খুঁজে বেড়াইনি। বরং বেড়াতে বেরিয়েই খুঁজে পেয়েছি উপন্যাসের পটভূমিকে। আমার স্বামী পেশায় ছিলেন একজন খনিজ ভূতত্ত্ববিদ। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজের জন্য তাকে প্রায় সারা বছরই ঘুরতে হতো বাংলাদেশের প্রান্তে-প্রত্যন্তে। মাঝে মাঝে আমিও তার সঙ্গী হতাম। উদ্দেশ্য নিছক বেড়ান। এই রকম ঘুরে

বেড়াতে বেড়াতেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদ ও জনগোষ্ঠী আমাকে আকৃষ্ট করতো। এই আকর্ষণেই অনুপ্রাণিত হতাম তাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস রচনায়। এমনি এক ভ্রমণে আকৃষ্ট হয়েছিলাম বহুল প্রশংসিত উপন্যাস 'একাল চিরকাল' রচনায়। সময়টা আশির দশক। উত্তরবঙ্গের মিঠাপুকুর ও বড়পুকুরিয়ার খনিজ কয়লা এবং কঠিন শিলার মাইনিংয়ের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন আমার স্বামী মিজানুর রহমান, সঙ্গে আমিও আছি। এলাকাটি সাঁওতাল অধ্যুষিত, প্রান্তরময়। যেখানে আমরা থাকতাম, জায়গাটি চমৎকার। বিশাল দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তর, কাকচক্ষু সুস্থির এক নদী আর হাওয়ায় মর্মরিত অজস্র শাল গাছ সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকতো আমাকে। প্রায় সারাদিনই ঘুরে বেড়াতাম। এমন ঘুরতে ঘুরতেই ঢুকে পড়তাম আদিবাসী সাঁওতালদের গ্রামে। ওদের সরলতা আর আতিথ্য যেমন ভালো লাগতো তাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন আমাকে বিষণ্ন করতো। সেখানেই দেখেছিলাম মাটির তৈরি জীর্ণ কুঁড়ের গীর্জাঘরের পুরোহিত জোসেফ কুজুরকে। ধূলি ধূসরিত বেঢপ এক রঙ-চটা উলের সোয়েটার আর ছেঁড়া গিঠ দেয়া জীর্ণ বিবর্ণ লুঙ্গি পরে প্রার্থনাগৃহের মাটির উঠোন ঝাড়ু দিচ্ছিল, বলল, 'খনি থেকে কি কেরোসিন তেল উঠবে? উঠলে ভালোই হবে। বড় গরিব আমরা। পয়সার অভাবে কেরোসিন কিনতে পারি না। মা মেরীর সামনে সন্ধ্যায় আলো জ্বালতে পারি না, বড় দুঃখ মনে।' সে পাড়ারই মেয়ে বাসন্তী হাসদা। গরীব তবু হাস্যময়ী, সুরসিকা। হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করেছিল- তোদের ওই খনি থেকে কি তুলবে রে খনির সাহেবরা? ভাত? আমরা তো একটা বেলাও ছেলেমেয়েদের ভাত দিতে পারি না। বাংলাদেশের সাঁওতালদের বঞ্চিত, দুঃখী অথচ সরল বিশ্বাসে প্রাণবন্ত জীবনকে উপন্যাসে ধরে রাখবার তাগিদটা তখনই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এরপর সেখানে ঘুরে বেড়ানোটা হয়ে উঠেছিল, একটি জনপদের জীবনকে জানবার জন্য ভ্রমণ।

এমনই ঘটেছে চা-বাগানের জীবন নিয়ে লেখা 'সূর্য সবুজ রক্ত' উপন্যাসটি লিখবার ক্ষেত্রে। ভূমিকার সূত্রপাত হয়েছিল সিলেটের মৌলভীবাজারের এক চা বাগানে। সেখানে একঝাঁক টি-প্লাকার তরুণী আমাকে আকর্ষিত করেছিল। হাসির ঝড়ো ঝাপটায় বাতাস শিহরিত করে, বিশাল সবুজের জগতে নানা রঙের প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল যেন তারা। মুগ্ধ হয়েছিলাম, তারপরই আকৃষ্ট হলাম সেই বিশাল সবুজের মানুষদের জীবনের প্রতি। শুরু হলো চা-বাগানে ঘুরে বেড়ান। অজানা এক জগৎ যেন অপঠিত গ্রন্থের মতো একটির পর একটি পৃষ্ঠা মেলে ধরতে থাকলো আমার সামনে। সেই মনমাতানো হাসির আর রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়ানো সবুজ জগৎ থেকে জেগে উঠতে থাকলো, দুঃখ, বঞ্চনা হতাশা অথচ আনন্দ আর উৎসবের বৈচিত্রে এক বিচিত্র না জানা জীবন। সেখানেই অঙ্কুরিত হলো আমার 'সূর্য সবুজ রক্তে'র চারা, যেন চায়ের নবীন দুটি পাতা উন্মিলিত হলো একটি কুঁড়ির সংবাদ নিয়ে। এমনভাবেই তো জন্ম নিয়েছে আমার এক একটি আঞ্চলিক জনপদ ভিত্তিক উপন্যাস। সব সময় কিন্তু লেখার তথ্যের জন্য ভ্রমণ আমি করিনি, বরং ভ্রমণ তুলে দিয়েছে আমার হাতে লেখার কলম।

প্রশ্ন : আমাদের সমালোচনা সাহিত্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য জানতে চাইছি।

রিজিয়া রহমান : বাংলা সাহিত্যে (অবিভক্ত বাংলার যুগে) সমালোচনা সাহিত্যের অবস্থান ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাহিত্যের এই শাখাটি তখন গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচিত হতো। সমালোচনার মান ও উৎকর্ষের কারণে এ সাহিত্য অনেক সময় মূল রচনাকেও অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হতো। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র রচনার সমালোচনা গ্রন্থ 'রবিরশ্মি' নামক সমালোচনা গ্রন্থটির উল্লেখ করতে পারি। বুদ্ধদেব বসু মূলত কবি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সমালোচনা লিখে তিনি সমালোচনা সাহিত্যের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করেছিলেন। ইদানীং আমাদের দেশে, সাহিত্যের এই শাখাটি প্রায় নির্জীবই বলা যায়। ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে চলেছে যেন। যে সব সমালোচনা মাঝে মাঝেই দৃষ্টিগোচর হয়, তার অধিকাংশই অতিশয়োক্তি অথবা বিশ্লেষণহীনতার দোষে দুষ্ট, কিংবা যুক্তি বিবর্জিত অগভীর বাগাড়ম্বর মাত্র। এ ছাড়া যে সব সাহিত্য আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হাতে আসে সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ক এমফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির অভিসন্দর্ভ পত্রের গ্রন্থায়ন। যা একান্তভাবেই একাডেমিক। সমালোচনা সাহিত্যের মান বা রস তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না।

প্রশ্ন : সম্প্রতি বহুল উচ্চারিত দুটি টার্ম হচ্ছে 'উত্তরাধুনিকতা' এবং 'যাদু বাস্তবতা'। কথাসাহিত্যে এ দুটি বিষয় নিয়ে আপনার পর্যবেক্ষণের কথা বলুন।

রিজিয়া রহমান : বিশ্বের শিল্প সাহিত্যের নান্দনিকতার উৎকর্ষতা যাচাইয়ে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পর থেকে আজ পর্যন্ত যে সব নন্দনতাত্ত্বিক প্রকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়েছে, উত্তর আধুনিকতা বা যাদুবাস্তবতা সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলা চর্চাকে বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদী তত্ত্বের দ্বারা আবদ্ধ করা হলেও পরবর্তীকালে তার বিলোপ ঘটিয়ে উদ্ভব হয়েছিল শিল্পচর্চার আধুনিকতাবাদ। রিয়্যালিজম বা বাস্তবতাবাদই যার মূল ভিত্তি। মানব সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিই বার বার শিল্পের 'ফরম' বা আঙ্গিক নির্ধারণে এসব নিরীক্ষাধর্মী তাত্ত্বিকতার জন্ম দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব তাত্ত্বিকতার উদ্ভব ও বিলুপ্তি পাশ্চাত্য চিন্তাশীলতার মাঝেই ঘটতে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ এবং নগরায়নের প্রসার ইউরোপীয় দেশগুলোর সামাজিক জীবনকে আবেগশূন্য নিঃসঙ্গতায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, জীবন যাপনে অনভিপ্রেত জটিলতার জন্ম দেয়। মানুষ হয়ে ওঠে উন্মুল এক অভিবাসী। শিল্প সাহিত্যে তাই যন্ত্রণার্ত অতৃপ্ত মানুষের বিবরগামী জটিলতাই উঠে আসতে থাকে। আধুনিক সাহিত্যে প্রতীকবাদ অথবা সুন্দরের পরিবর্তে অসুন্দর ও কুৎসিতকেই নান্দনিক আদর্শে স্থাপন করা হয় চিত্রশিল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই নব্য আধুনিকতা যেমন বিমূর্ততাকে বাহন করে তোলে, সাহিত্যেও তেমনি প্রতীকের ব্যবহার, ইঙ্গিতবহ বক্তব্য প্রাধান্য পায়। আধুনিকতার এই যাত্রায় আসে উত্তর আধুনিকতার পরিবর্তিত হাওয়া। বলা বাহুল্য, এসবই জার্মানি ও ফরাসি দেশের চিন্তাশীলতার থেকে উঠে আসা পাশ্চাত্য হাওয়ায় প্রবাহিত শিল্প ভাবনা যা ছিল পাশ্চাত্য সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের বাস্তবতা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের উপনিবেশভুক্তির অভিজ্ঞতার কারণে এসব মতবাদকে তাদের শিল্প চর্চার অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবেই অনুসরণ করা হয়। আমাদের কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সময়কাল থেকেই যে আধুনিকতার শুরু, সে আধুনিকতার সঙ্গে জার্মানির আধুনিকতাবাদের আন্দোলনের ভিত্তিগত সাদৃশ্য খুব একটা ছিল বলে মনে হয় না। তবুও বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় পৃথিকৃৎ বুদ্ধদেব বসু, সুধীনদত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য কবিরা ইয়োরোপীয় এই নন্দনতত্ত্বকে সরাসরি গ্রহণ করে উত্তরাধুনিকায়নের উত্তরণের সূচনা করলেন। 'কলোনিয়াল' অথবা 'পোস্ট কলোনিয়াল' সংজ্ঞায়িত সাহিত্যের যুগ বিভাগের পরিবর্তে সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাজনে আধুনিক ও আধুনিকোত্তর বা যুদ্ধোত্তরকালের সাহিত্য শিরোনামটি ব্যবহার করলেন, অনায়াসে।

যে সংজ্ঞা বাস্তবতা থেকে দূরে ছিল বলেই আমার ধারণা। বিশ্বব্যাপী দু'টি মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন এনেছিল নিঃসন্দেহে, পৃথিবীব্যাপী পাশ্চাত্য উপনিবেশগুলোতে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জেগে উঠেছিল প্রবলভাবে, অথচ বাংলা কথাসাহিত্য তখন ইয়োরোপীয় শিল্প তত্ত্ববাদের আধুনিকতাকে ধারণ করে উত্তর-আধুনিকতার অভিযাত্রী। আমাদের সাহিত্যের এই অভিযাত্রার মতোই বিশাল ভূখণ্ড লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যও শুরু করেছিল একইভাবে।

পাশ্চাত্য নির্ধারিত নান্দনিকতার আদর্শে পথচলা, শুরু হয়েছিল সেখানে শিল্পচর্চায় ইয়োরোপীয় আধুনিকতাবাদ অনুসারী আন্দোলন, উত্তর-আধুনিকায়নের সূচনা।

আমাদের কথাসাহিত্যে ইয়োরোপীয় শিল্পচর্চার উত্তর আধুনিকতা ও লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রসঙ্গে এইটুকুই আমার বলার আছে- সাহিত্য আঙ্গিক বিবেচনায় দু'টি 'টার্মই' যথেষ্ট পুরান হয়ে গেছে, এ নিয়ে নতুন করে কথাসাহিত্যের আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থহীন বলেই মনে করা যেতে পারে, বরং নিজস্ব ধারার শিল্প আঙ্গিক নির্ধারণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকেই আমি স্বাগত জানাতে চাই।

প্রশ্ন : নারীবাদী সাহিত্য বলে একটি টার্ম ব্যবহৃত হয়। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

রিজিয়া রহমান: মহিলাদের লেখাকে নারী-সাহিত্য যদি বলা হয়, তাহলে মহিলা স্বার্থবিষয়ক সাহিত্যকে নারীবাদী সাহিত্য বলা যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যে কোনো বাদ বা স্লোগানধর্মিতা সমর্থন করি না। যদিও আমি এটাও মনে করি না যে, 'শিল্পের জন্যই' কেবল শিল্পচর্চা। নারীবাদী সাহিত্য 'টার্ম'টি আসলে পাশ্চাত্য ভাবধারা বাহিত। পাশ্চাত্য দেশেই এর উদ্ভব এবং প্রচার ও প্রসার। পাশ্চাত্য সমাজসংশ্লিষ্ট অসংখ্য মতবাদ উদ্ভবের মতোই নারীবাদও একটি মতবাদ মাত্র, সাহিত্য বস্তুত সর্বজনীন, সর্বকালের সব মানুষেরই জীবনালেখ্য। নারীবাদী সাহিত্যে আমি আস্থাশীল নই।

প্রশ্ন : নারী হওয়ার কারণে একজন লেখক হিসেবে আপনি কোনো সুবিধা পেয়েছেন কি না কিংবা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন কি না?

রিজিয়া রহমান : সাহিত্যে নারীদের জন্য বিশেষ কোনো কোটার ব্যবস্থা সম্ভবত নেই। থাকলেও সুযোগটি নিতাম কি না সন্দেহ। না, নারী হওয়ার সুবাদে কোনো সুবিধা আমাকে নিতে হয়নি। অসুবিধা যেটুকু তা নিজের ঘর-সংসার নিয়ে, তাও খুব সামান্যই। তেমন অসুবিধা হলে সম্ভবত বাংলাদেশের সাহিত্যে আমার অবদান রাখা সম্ভব হতো না। নারী হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে রেড লাইট এলাকার উপন্যাস 'রক্তের অক্ষর' লিখতে গিয়ে সেটি আমি অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের অপারগতাটুকু ছিল সে সময়ের। আশা করছি আজকের সমাজের কোনো তরুণী লেখিকাকে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না।

প্রশ্ন : আপনার ভেতরে কি কোনো অতৃপ্তি কাজ করে?

রিজিয়া রহমান : করে, যথেষ্টই করে। কোন মানুষের করে না? লেখক হিসেবে নিজের লেখা নিয়ে যদি তৃপ্ত বা অতৃপ্ততার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে বলব আমার কোনো লেখাই আমাকে তৃপ্ত করেনি। যা দেখেছিলাম, যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম, যা বলার ছিল, তার অনেকখানিই পারিনি।

প্রশ্ন : নতুনদের লেখা কি পড়েন? নতুনদের সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই।

রিজিয়া রহমান : পড়ি। অনেকের লেখা বেশ ভালো লাগে। কয়েকজন তো বেশ ভালো লিখছেন।

নতুনদের তো সবে যাত্রা শুরু। আরো অনেক কিছুই তাদের দেওয়ার রয়েছে। মূল্যায়নটা এখনই করে ফেললে সেটা অসম্পূর্ণতার দোষে দুষ্ট হতে পারে। তবে একটি কথা আমি যেমন জেনেছি, তারাও নিশ্চয়ই জানবেন বা জানেন যে, সাহিত্যচর্চা একাগ্র সাধনার বিষয়। সস্তা প্রসার বা দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় প্রতিভাকে নিম্নগামী করে দিতে পারে। নিবেদিত প্রতিভা কখনো বিনষ্ট হয় না।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের অনেক নারী লেখক সংসার জীবনে প্রবেশ করে লেখালিখির জগৎ থেকে হারিয়ে গেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। কীভাবে এটা সম্ভব হলো সে ব্যাপারে জানার আগ্রহ রয়েছে।

রিজিয়া রহমান : হয়তো সাহিত্যচর্চার প্রতি আর একান্ত একাগ্রতাই আমাকে হারিয়ে যেতে দেয়নি। এই কারণেই সম্ভবত যে সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে আমি একটি সংসারে প্রবেশ করেছিলাম, সেটি বিঘ্নিত হয়নি। সাহিত্যচর্চা আমার সত্তায় এমনভাবে মিশে ছিল, আমার সংসার জীবনে এটি একটি স্বীকৃত বিষয় হয়ে গিয়েছিল। তবে স্বীকার করতেই হবে, আমার স্বামী বা পারিবারিক পরিবেশ আমাকে সহায়তাই দিয়েছে। সেদিক থেকে আমাকে কোনো প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়নি। বাধাপ্রাপ্ত যেটুকু হয়েছি তা শারীরিক অসুস্থতা ও অর্থনৈতিক বিপত্তির কারণে। কিন্তু এসব প্রতিকূলতা কখনো আমাকে বিরুদ্ধতায় বন্দি করতে পারেনি।

প্রশ্ন : লেখকের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্টের কথা আমরা বলে থাকি, আপনার লেখালেখির নেপথ্যে ব্যাপারটি কিভাবে ক্রিয়াশীল?

রিজিয়া রহমান : শুধু লেখকেরই নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার দায় সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে বলে আমি মনে করি। এ বিবেচনায় লেখকের দায়বদ্ধতা বা কমিটমেন্ট আমি অস্বীকার করি না। এখানে একটি কথা বলার আছে, শিল্পচর্চা উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হলে শিল্পরস অনেক সময় বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে লেখকও তো সামাজিক জীবই। সমাজ, মানুষ, পরিবেশ এবং সামাজিক মূল্যবোধ তার মনোজগৎকে প্রভাবিত করে। সমাজে, মানুষ ও তার অধিকারে বিনষ্টি লেখকের চিন্তাশীলতার জগতে বিদ্রোহের আলোড়ন সৃষ্টি করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তখন লেখককে কলম ধরতেই হয়। সমাজ এবং মানুষের প্রতি তার কমিটমেন্টই তাকে পরিচালিত করে। তবে শিল্পের সীমানা সম্পর্কে তাকে সচেতন থাকতে হয়। এমনই কমিটমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমি লিখেছি বেশকিছু গল্প এবং উপন্যাস, 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাসটিতে আমি সচেতনভাবেই দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেছি, সুসভ্য কথিত আধুনিক পৃথিবীর কালে পতিতাপল্লীতে মানুষের অবিশ্বাস্য নির্যাতিত জীবন আমাকে বিদ্রোহী করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে এর বিপক্ষে কলম ধরতে। তবু চেষ্টা করেছি শিল্পের সীমানাটি রক্ষা করতে। তথাপি সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগ আমাকে রেহাই দেয়নি। যদি এ অভিযোগে যথার্থতা থেকে থাকে তাহলে নিঃসংকোচে স্বীকার করতে পারি, আমার কমিটমেন্ট আমার শিল্পীসত্তাকে অতিক্রম করে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, মানুষকে উপেক্ষা করে শিল্পচর্চা বড় হয়ে উঠতে পারে না।

'আর্ট ফর আর্টস সেক'- এই কলাকৈবল্যবাদী বিশ্বাসকে একজন আধুনিক লেখক হয়ে অন্ধভাবে কেউ কখনো মেনে নিতে পারেনি। আমিও না।